# ধর্মপূজাবিধিবিধান : পুথিভিত্তিক সম্পাদনা ও আলোচনা

পিএইচ.ডি (কলা অনুষদ) উপাধি লাভের জন্য উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভের সারসংক্ষেপ


## শোহিনি ভট্টাচার্য

তত্ত্বাবধায়ক

**অধ্যাপক ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস**

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কোলকাতা-৭০০০৩২


২০২১

## *অধ্যায় পরিকল্পনা-*

কথামুখ

প্রথম অধ্যায়- ধর্মঠাকুর, ধর্মপূজা ও পূজক-সম্প্রদায়

দ্বিতীয় অধ্যায়- প্রাপ্ত পুথি-সম্বন্ধীয় বিশেষ তথ্যবিচার ও কবিপরিচয়

তৃতীয় অধ্যায়- শ্রীধর্মপুরাণের কাব্য-কথায় রামাই, ময়ূরভট্ট ও অন্যান্য কবির ভূমিকা

চতুর্থ অধ্যায়- প্রাপ্ত পুথির বিভিন্ন উপকথা

পঞ্চম অধ্যায়- পুথি-পাঠ ও সম্পাদনা

ষষ্ঠ অধ্যায়- সম্পাদিত পাঠে প্রাপ্ত নতুন তথ্য

সপ্তম অধ্যায়- গবেষণার মূল নির্যাস

অষ্টম অধ্যায়- অপরিচিত শব্দ ও তার অর্থসূচি

চিত্রসূচি

আকরপঞ্জি

# *কথামুখ*

'শূন্য-পুরাণ' মূলত শ্রীধর্মরাজের পূজাপদ্ধতির আকরগ্রন্থ হিসেবেই পরিচিত; ধর্মপূজার্চনার আদিগুরু রামাই পণ্ডিত এর প্রণেতা। বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে পড়লে বৌদ্ধধর্মের মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধর্মপণ্ডিত রামাই তৎপর হয়েছিলেন। যদিও পণ্ডিতমহলে এ নিয়ে সংশয়ের অন্ত নেই যে, শূন্যপুরাণের রচয়িতা রমাই পণ্ডিত এবং ধর্মপূজাবিধিবিধানের রচয়িতা রামাই পণ্ডিত আদৌ একই ব্যক্তি কিনা। অনেকের মতে আবার 'ধর্ম্মপূজা-বিধান' রামাই-এর দ্বিতীয় রচনা, যেটি পরবর্তীকালে, ১৩২০বঙ্গাব্দে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশ পেয়েছিল [এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত, তালপাতার পুথি, নং৫৩৩৮]। শূন্যমূর্তি নিরঞ্জন ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রকাশই রামাইয়ের গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ছিল; শ্রীধর্মের বিশ্বসৃষ্টি প্রবর্তন বৃত্তান্ত দিয়ে এই গ্রন্থের সূচনা এবং 'যবন'-অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে সদ্ধর্মী-বৌদ্ধদের রক্ষার বিবরণ তথা 'শ্রীনিরঞ্জনের উষ্মা' দিয়ে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

আমাদের গবেষণায় সম্পাদনার কাজে ব্যবহৃত মূল পুথিটির [বিশ্ব.১২৯সংখ্যক] বিষয়বস্তুর দিকে চোখ রাখলে দেখা যায়- সৃষ্টিপত্তন, বারোমাসি, শূন্যবাদ, ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা, সংজাত পদ্ধতি, ধর্মপূজাবিধান, পুষ্পাঞ্জলি, হোম-যজ্ঞ, ধর্মপ্রণাম প্রভৃতি নানান ছোটো ছোটো পর্যায়ে ধর্ম-দর্শন ও পুরাণের ভাবসম্পদ এতে ব্যাখ্যাত হয়েছে আধা-সংস্কৃত ও আধা-বাংলাভাষায়। রাঢ়বঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় লৌকিক পুরুষ-দেবতার এই বন্দনাগীতিকে শুধুমাত্র মধ্যযুগীয় বাংলা মঙ্গলকাব্যের শাখা বলে বিচার করলেই চলবে না, এর মধ্যে নানান ধর্ম-উপধর্ম, ব্রত-কৃত্য, আচার-আচরণ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এমনকি দৈবমাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশে রয়েছে টুকরো কিছু উপাখ্যানও- রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্রলাভ, মার্কণ্ডমুনির কুষ্ঠরোগমুক্তি, ধান্যের জন্ম, ছাগের জন্ম, পাসানসিংহের আখ্যান ইত্যাদি। প্রাপ্ত পুথিতে রামাই-এর জন্মবৃত্তান্ত বা তৎসংক্রান্ত গল্প-উপাদান অনুপস্থিত; পরিবর্তে রীতি-নিয়ম, বার-ব্রত, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি নিয়ে এমনভাবে পদ্যগুলির সজ্জা, যেগুলি পুরাণকথা পাঠের মতোই ধর্মপূজার সময় আবৃত্তি করা যায়। আমাদের অনুমান, পুথিটি তাই 'শূন্য-পুরাণ' নয়, বরং ধর্মপূজাবিধিবিধান সংক্রান্ত।

রামাই পণ্ডিত এই পূজার আদি-পুরোহিত, তাঁর প্রবর্তিত বিশেষ পূজাবিধিই পরবর্তীতে তাঁর শিষ্যরা অনুসরণ করেছিলেন। কালান্তরে এই ধর্মপূজক-শিষ্যদের মুখে মুখে প্রচারিত নানান পাঁচালি বা ধর্মমাহাত্ম্যসূচক লৌকিক ছড়া পূজানুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক হিসেবে ব্যবহৃত হতে হতে নানান সময়ে হয়তো হরিশ্চন্দ্র-আখ্যানের মতোই রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত হয়ে গেছে। কারণ শ্রীধর্মপুরাণের গঠনগত আলোচনায় বিদগ্ধ পণ্ডিতেরাও রচনাশৈলী, ভাষাভঙ্গির প্রয়োগ এবং কাব্যদেহ নির্মাণের বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করে রামাই পণ্ডিতের নামের আড়ালে একাধিক রচয়িতা ও ভিন্নকালের রচনারীতির সুস্পষ্ট নিদর্শন পেয়েছেন।

## *অধ্যায় সংক্ষেপ*

### প্রথম অধ্যায় - ধর্মঠাকুর, ধর্মপূজা ও পূজক-সম্প্রদায়

ধর্মঠাকুরের সুনির্দিষ্ট কোনও বিগ্রহরূপ নেই। পুরাণোক্ত এই ধর্মরাজ কখনও বৌদ্ধদেবতা ধম্ম, কখনও সূর্যদেবতা, কোথাও শিব, বিষ্ণু, যমরাজ অথবা মুসলমান ফকিরবেশে, কোথাও কূর্মপ্রতীকে, কোথাও নিছক শিলারূপে, কোথাও বা কাঁকড়াবিছে হিসেবেই এখনও পূজিত হয়ে চলেছেন। আবেস্তা-বেদ-পুরাণ, প্রাগার্য-অনার্য-বৈদিক ও তান্ত্রিক আর্য সংস্কৃতির নানান ধারার মধ্যে ইতিহাস-ভূগোলের দেশকাল ছাড়িয়ে নানান বেশে মিশ্রভাবে এঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে। নিরাকার নিরঞ্জন এই পরমপুরুষ যেমন নাথ-বাউল-সুফি সম্প্রদায়ের ধর্মপন্থের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন, তেমনই তিনি চৈতন্যস্বরূপ পরমানন্দময় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মিলিত সনাতন করুণাময় সত্তারূপে পূজিত। কাজেই, লৌকিক-পৌরাণিক-বৌদ্ধ-জৈন-শৈব-বৈষ্ণব এমনকি কিছু পরিমাণে ইসলামী সংমিশ্রণও ধর্মরাজের মধ্যে ঘটেছে। রাঢ়বঙ্গের এক এক জায়গায় তাঁর এক এক নাম; যেমন- বাঁকুড়ায় তিনি বাঁকুড়া রায়, কৌতুক রায় বা ক্ষুদি রায়। বীরভূমে তিনি বিনোদ রায়, তুলো রায় বা কেলে রায়। আবার

বর্ধমানে তাঁর পরিচিতি কালা রায় বা খেলা রায় নামে। এছাড়াও মোহন রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, শ্যাম রায়, বুড়া রায়…এমন কত কী স্থানীয় নাম তাঁর! এই 'রায়' শব্দটির উৎস সংস্কৃত রাজ-শব্দ, ধর্মরাজের উপাধিতে তাই এমন রাজকীয় শোভা।

ধর্মঠাকুরের উপাসক হলেন মূলত রাঢ়ের অব্রাহ্মণ, অন্ত্যজ তথা ব্রাত্যজনেরা। ডোম-জেলে-বাগদি-বাউরি-মাল-মেটে প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষত ডোম জাতিভুক্তরা এর প্রধান পূজারি হয়ে থাকেন। পূর্বে এঁদের বলা হতো পণ্ডিত, পঁড়িত বা ধর্মপণ্ডিত; অনেকে আবার দেয়াসী বা দেবাংশী উপাধিতেও পরিচিত। ধর্মঠাকুরের বিশেষ পূজা-পদ্ধতি, আচার-আচরণ, ব্রত-মন্ত্র এঁদের একচ্ছত্র অধিগত বিষয়। যেসমস্ত গ্রামে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য, সেখানে বাৎসরিক পূজানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা পুজোর অধিকার হয়তো বা পেয়েছেন, কিন্তু জাগ্রত দেবতার নামে তুকতাক, মাদুলি, ওষুধ ইত্যাদির আনুষঙ্গিক অধিকার থেকে তাঁরা চিরকালই বঞ্চিত। ব্রাহ্মণরা যেমন উপবীতধারী, তেমনই ধর্মরাজের এইসমস্ত ডোম-পূজারিরা হলেন তাম্রদীক্ষিত। এর অর্থ, বাহুতে তামার তাগা এবং এবং হাতে তামার আংটি ধারণ না করলে ধর্মঠাকুরের পূজার্চনায় পৌরোহিত্য করার অধিকার পাওয়া যায় না। রামাই পণ্ডিতের 'ধর্মপুজা-বিধিবিধান' হলো এইসব ধর্মপূজাপদ্ধতির আকরগ্রন্থ। রাঢ়বঙ্গের নিম্নবর্গীয় সমাজে এককালে এইসব পঁড়িত-রা ভয়াবহ কুষ্ঠরোগের চিকিৎসাও জানতেন, ফলে তাঁদের বিশেষ সমাদরও ছিল। ক্রমশ তাঁদের পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসার সূত্রেই বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মরাজের মাহাত্ম্যও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবেই হয়তো তাঁদের বংশধরের হাত ধরে পরবর্তীকালে লাউসেন বা হরিশ্চন্দ্র-মদনার মতো ধর্মমঙ্গলের জনপ্রিয় কাহিনিগুলির জন্ম এবং প্রচার। পঁড়িত-বংশীয় উত্তরাধিকারীরাই ভবিষ্যতে হয়ে উঠেছেন ধর্ম-মাহাত্ম্যকথার কবি বা গায়েন।

এ তো গেলো ধর্মরাজের নানান স্বরূপ, তাঁর পূজার রীতিনীতি এবং পূজকগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ। আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে আমরা চোখ রেখেছি ধর্মপূজাপদ্ধতি ও মন্ত্রাচারের আকরগ্রন্থ 'ধর্মপূজাবিধিবিধান' এবং তার প্রথম স্রষ্টা ও সংকলক তথা ধর্মপূজার আদিগুরু রামাই পণ্ডিত-এর সময়কাল ও ঐতিহাসিকতা বিষয়ে।

অধ্যায়ের পরিশেষে আর একটি বিষয়ের আলোচনা সংযোজিত হয়েছে- শাকদ্বীপী সূর্যোপাসক ব্রাহ্মণ তথা ধর্মপূজক গ্রহবিপ্র পণ্ডিতদের প্রসঙ্গ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়- প্রাপ্ত পুথি-সম্বন্ধীয় বিশেষ তথ্যবিচার ও কবিপরিচয়

দ্বিতীয় অধ্যায়টি পুথি-সম্পাদনা বিষয়ক। আলোচ্য অধ্যায়ের প্রথম পর্বে আমরা আলোচনা করেছি শ্রীরামাই-এর 'শূন্য-পুরাণ' রচনার গ্রন্থসম্পাদনা প্রসঙ্গে। শূন্যপুরাণের রচনাকাল, স্রষ্টা, স্থান-নাম, ঐতিহাসিকতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে বহুমুখী গবেষণাপূর্ণ তথ্যসন্নিবেশে প্রাগাধুনিক বাংলা মঙ্গলকাব্যের প্রায়-অনালোচিত এই ধারাটির নিবিড় অনুসন্ধানে অবগাহন করেছি।

আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা বুঝে নিতে চেয়েছি, আমাদের গবেষণাকর্মে গৃহীত পুথিটি থেকে প্রাপ্ত **পুথিপরিচয়** সম্পর্কিত তথ্যে। বর্তমানে সম্পাদিত এই পুথিটি বিশ্বভারতীর লিপিকা পুথিশালায় সংরক্ষিত ১২৯সংখ্যক পুথি। পুথিটি তেরেটপাতায় লিখিত; শ্রীরামাই পণ্ডিতের ভণিতায় আদ্যন্ত একাধিক অনুলিপিকারের হস্তলিখিত একটি গুচ্ছবদ্ধ পুথিবিশেষ। পুথিটির বিভিন্ন অংশ তাই আনুমানিক পাঁচ-দশ বছরের কম-বেশি সময়ান্তরে লিখিত বলে আমাদের মনে হয়েছে। বলা যায়- ধর্মরাজের মহিমাজ্ঞাপক নানান উপাখ্যান ও ধর্মপূজার রীতি-নীতি, মন্ত্র-আচার সম্বলিত আধা-বাংলা, আধা-সংস্কৃত ভাষায় রচিত এ পুথিখানি অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তীকালীন সময়পর্বের টুকরো টুকরো রচনার সংকলন বিশেষ। শ্রীধর্মরাজের পূজাপাঠে সমবেত মন্ত্রোচ্চারণ ও নিয়মকানুন অনুসরণের জন্য পূজকগোষ্ঠীর প্রত্যেকের কাছেই প্রায় অনুরূপ পুথির অনুলিপি থাকত। প্রাপ্ত পুথিটিও ধর্মপূজাবিধিবিধান সম্বলিত এমনই এক পুথিবিশেষ।

## তৃতীয় অধ্যায়- শ্রীধর্মপুরাণের কাব্য-কথায় রামাই, ময়ূরভট্ট ও অন্যান্য কবির ভূমিকা

রাঢ়বাংলার এই জনপ্রিয় লৌকিক পুরুষদেবতাটিকে নিয়ে মঙ্গলকাব্যের ধর্মসাহিত্যধারায় মোট তিনপ্রকার গ্রন্থরচনা হয়েছিল- একটি হলো ধর্মপূজার বিধিবিধান সংক্রান্ত গ্রন্থ, যা অন্য কোনও মঙ্গলকাব্যে দেখা যায়না; ধর্মপূজার মন্ত্র, দিন-ক্ষণ-তিথি, রীতি-নিয়ম, বিশেষ উপাচার পদ্ধতি সম্পর্কিত শাস্ত্রকথা। দ্বিতীয়টি হলো কবিপরিচয়, বিশ্বসৃষ্টিকথা, পূজারী ও পূজাসংলগ্ন নানান দৈবী উপকথা এবং ধর্মপূজার ইতিবৃত্ত সম্পর্কিত শূন্যপুরাণ; মঙ্গলকাব্যের প্যাটার্ন অনুযায়ী এর রচনারীতি। উক্ত দুই প্রকার রচনাই আদি পুরোহিত রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত। আর তৃতীয়টি হলো ধর্মমাহাত্ম্যকথা তথা ধর্মরাজের বরপুষ্ট নায়ক লাউসেনের কাহিনি। কবি ময়ূরভট্টকে আমরা বলতে পারি ধর্মায়ণের কাহিনিকথা তথা ধর্মমঙ্গল-সঙ্গীতের আদ্য-কবি। তিনিই সর্বপ্রথম লাউসেনের পালা রচনা করেছিলেন; পরবর্তী ধর্মমঙ্গলকবিরা ময়ূরভট্টের অনুসরণেই ধর্মমাহাত্ম্যগাথা রচনা করেছেন।

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা রামাই এবং ময়ূরভট্টের কবিকৃতিত্ব আলোচনার পর ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার অন্যান্য ছোটো-বড়ো প্রায় পঁচিশজন কবির কাব্য-কথা নিয়ে টুকরো টুকরো আলোচনা করেছি।

## চতুর্থ অধ্যায়- প্রাপ্ত পুথির বিভিন্ন উপকথা

বর্তমান সম্পাদিত পুথিপাঠে আমরা বেশ কয়েকটি উপকথা তথা আখ্যানভাগের অংশ দেখতে পাবো, যেগুলির উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু অংশ প্রাপ্ত পুথিতে পাঠান্তরসহ পৌর্বাপর্যহীনভাবে পুনরাবর্তিত হয়েছে।

লক্ষ করলে বোঝা যায়, আখ্যানগুলি কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত কাহিনি নয়। বরং শ্রীধর্মরাজের পূজার প্রচলন ও প্রচারের জন্যই ধর্মপূজাকে কেন্দ্র করে তাঁর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক এই গল্পগুলির বয়ন। ফলে একথা বলা যেতে পারে, ধর্মমঙ্গল কাব্য তৈরির পূর্বেই এই আখ্যানগুলির জন্ম। এইরকম বিশেষ কয়েকটি আখ্যান বিষয়ে সবিস্তারে পুথির পাতার চিত্রযোগে আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। কাহিনিগুলির মূল বিষয়বস্তু কঠিন ধর্মসঙ্কট, দুরারোগ্য ব্যাধি বা পুত্রহীনতার বেদনায় জর্জরিত মানুষের অসহায়ত্ব, কঠিন যন্ত্রণাভোগ এবং অবশেষে শ্রীধর্মরাজের আরাধনায় তাঁর কৃপাদৃষ্টিলাভ। যেমন- ঋষি মার্কণ্ডের কুষ্ঠরোগমুক্তির আখ্যান, রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রানি মদনার পুত্রলাভকথা, নিরঞ্জনের উষ্মা ও তৎসংলগ্ন পাসানসিংহের আখ্যান ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

## পঞ্চম অধ্যায়- পুথি-পাঠ ও সম্পাদনা

আলোচ্য অধ্যায়টিতে রয়েছে প্রাপ্ত পুথির মূল পাঠোদ্ধার এবং তার সম্পাদনা। আধা-বাংলা আধা-সংস্কৃত ভাষায় এর রচনাশৈলীর নির্মিতি। তেরেট পাতার ওপর কালো কালির ব্যবহারে পুথিটির প্রতিটি পত্রের উভয়দিকে একটানা সারিবদ্ধ হয়েছে পঙক্তিগুলি। সংখ্যাচিহ্নসহ পুথির মোট ৭৮ টি পত্রই পরপর সাজিয়ে তৈরি হয়েছে সম্পাদিত পাঠ। প্রতিটি পত্রের অন্তর্গত পৃষ্ঠার পাঠোদ্ধারের শেষে সম্পাদিত শব্দের পাঠ যথাসাধ্য অনুসরণে প্রস্তুতির চেষ্টা করা হয়েছে। অপরিচিত শব্দের আনুমানিক পাঠ বা অর্থ উল্লেখেরও চেষ্টা করেছি আমরা। একইসঙ্গে পুনরাবর্তিত উপাখ্যানের অংশগুলি সহজেই বুঝে নেওয়ার সুবিধার্থে সম্পাদিত পাঠপ্রস্তুতির সময় শিরোনাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গগুলিও।

## ষষ্ঠ অধ্যায়- সম্পাদিত পাঠে প্রাপ্ত নতুন তথ্য

রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো ‘নিরঞ্জনের রুষ্মা’ (উষ্মা)-যে কাব্যাংশের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব প্রাগাধুনিক বাংলা মঙ্গলকাব্যধারার একটি বহুচর্চিত বিষয়। ‘রুষ্মা’ শব্দটির কোনও তৎসম ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না, শব্দটির পাঠে বা শ্রবণে কিছু প্রমাদ থেকে গেছে; হয়তো ধর্মরাজের উষ্মা-জনিত রোষ কল্পনা করেই এই নতুন শব্দটির জন্ম! প্রকৃতপক্ষে, ‘নিরঞ্জনের উষ্মা’ হলো ‘জালালি কলিমা’-র অংশবিশেষ, তুর্কি-কর্তৃক উড়িষ্যার জাজপুর-বিজয়ের ছবি এতে বর্ণিত। জাজপুরবাসী বেদ-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের দল অতিরিক্ত দক্ষিণার দাবীতে সাধারণ প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করলে সেখানে যবন-রূপী ধর্মঠাকুরের আবির্ভাব ও কৌশলে তাদের ধর্মান্তরিত করে শায়েস্তা করার কাহিনি হলো ‘নিরঞ্জনের উষ্মা’। বর্তমান সম্পাদিত পাঠে এই প্রসঙ্গটি একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে; এই অধ্যায়ে আমরা সেই বিষয়টিই বিশদে আলোচনা করেছি।

সাহিত্যের প্রথিতযশা ইতিহাসকারেরা প্রায় সকলেই হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বান্দ্বিকতার যুগ হিসেবে এর প্রেক্ষাপটকে বিচার করেছেন। ফলত, বৌদ্ধধর্মের ক্রমক্ষয়িষ্ণুতার যুগে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবল প্রতিপত্তি এবং অত্যাচারিত সদ্ধর্মীদের মুসলিমপ্রীতির স্মারক হিসেবেই সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় এর অবস্থান আমরা লক্ষ করেছি।

কিন্তু আমরা বলতে চাই এরূপ বিবিধ আঙ্গিক থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ হলো বিচ্ছিন্ন, আংশিক। কারণ ধর্মপূজার বিধিবিধান-সংক্রান্ত রামাই পণ্ডিতের ভণিতাযুক্ত পুথিটিতে(বিশ্ব. ১২৯নম্বর) বর্তমান গবেষণাকর্মের সম্পাদনা-সূত্রে ‘নিরঞ্জনের উষ্মা’র পূর্বে ও পরে এমন কিছু গল্প আমরা পাচ্ছি, যেখানে দেখা যাচ্ছে ধর্মপূজকদের বিশ্বাসমতে বিশ্বব্যাপী ধর্মরাজের সামগ্রিক সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গেই নানান মনুষ্যজাতির জন্ম হয়েছে; সেই সৃজনক্রিয়াতেই কালচক্রে মুসলমান জাতির জন্ম দিচ্ছেন পরমেশ্বর নিরঞ্জন তথা খোদারূপী ধর্মরাজ। বলা বাহুল্য, হিন্দুসমাজের এই বিশেষ অংশ তথা ধর্মসাধকদের চিন্তাভাবনা এইবিষয়ে ইসলামিক-দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র। হিন্দুসমাজের এই একাংশের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টির ব্যাখ্যা দাঁড়ায় এইরকম যে, ধর্মপূজকদের আরাধ্যদেবতাই আসলে অন্যরূপে মুসলমানদের খোদা; সুতরাং অন্যান্য সমস্ত মনুষ্যজাতির মতো মুসলমানরাও

শ্রীধর্মরাজের সৃষ্টিপত্তনের ফলে জন্ম নেওয়া এক জাতিবিশেষ। ধর্মপণ্ডিত রামাই এই অংশে যে কাজী, গাজী, খোদা, পেকাম্বর, বাবা আদম, ফকির বা নূরবিবির মতো পৌরাণিক তথা ঐতিহাসিক চরিত্রদের প্রতিস্থাপিত করছেন কার্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা চণ্ডী-মনসার মতো হিন্দু দেবদেবীদের স্থানে- তা আদতে হিন্দু পৌরাণিক প্যাটার্ন। নিজ ধর্মের দেবদেবীর আদলে এইসব ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন টুকরো ধর্মবিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্তির প্রবণতা হিন্দুপুরাণ-কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্মসাধকদের এই ঐকতানিক সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে সকল ধর্মের দেবদেবীরা এসে পড়েছেন এক ছত্রছায়ায়; আরাধ্য খোদা, ঈশ্বর ও ধর্মঠাকুর একীভূত হয়ে সৃষ্টি করছেন এই বিশ্বসংসার। সেই প্রসঙ্গেই 'নিরঞ্জনের উষ্মা'র পাঠগত অবতারণা।

এরপর লোকসংস্কৃতির কিছু টুকরো উপাদান আলোচনাসূত্রে আমরা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুনরূপে বুঝে নিতে চেয়েছি এই পাঠান্তরকে, যেখানে শূন্যপুরাণের সৃষ্টিবর্ণনের সর্বশেষ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে 'নিরঞ্জনের উষ্মা'।

পরিশেষে বলা যায়, রামাই পণ্ডিতের 'নিরঞ্জনের উষ্মা' কাব্যাংশের যে ব্যাখ্যা প্রথাগতভাবে চলে এসেছে, তার পুনর্বিবেচনার আশু প্রয়োজন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন-সহ বাংলা সাহিত্যের সকল স্বনামধন্য ঐতিহাসিকরাই তাঁদের রচনায় 'নিরঞ্জনের উষ্মা' বলতে পূর্বোক্ত ওই বিশেষ মধ্যবর্তী পাঠ্যাংশটিই রামাই পণ্ডিতের ভণিতাসহ উল্লেখ ও প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সপ্রসঙ্গ এর পূর্বের ও পরের গল্প দুটি হয়তো খেয়াল করেননি। এ রচনার একটি শুরুও আছে, শেষও আছে; যা বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করা হয়তো যুক্তিযুক্ত নয়। ফলত, পূর্বাপর কাহিনিসূত্র বিচার করে বলা যায় 'নিরঞ্জনের উষ্মা' কাব্যাংশটি মুসলমানদের প্রতি বন্ধুতা বা বৈরিতার আখ্যানমাত্র নয়; অত্যাচারিত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সঙ্গে ধর্মের ধ্বজাধারী হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ এবং তার পরিণতিতে মুসলমান-প্রীতি... এমন সিদ্ধান্তও নিছক বিচ্ছিন্ন কল্পনাজাত মান্যায়ন। আবার একে সমগ্র সদ্ধর্মী সম্প্রদায়ের জীবনভাবনার পরিচয়বাহীও বলে দেওয়া চলেনা। বর্ণহিন্দু সমাজের উচ্চ ও নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক ভেদযুদ্ধ ও তার ফলাফল এতে আছে একথা সত্য, কিন্তু সেটাই এই অংশের মূল আলোচ্য বিষয় এমন চিন্তাধারা খণ্ডিত। ধর্মপূজকদের বিশ্বাসদৃষ্টিতে, বিশ্বব্যাপী ধর্মরাজের সমগ্র সৃজনপ্রক্রিয়ার অন্তর্গত একটা খণ্ড বা সৃষ্টির অংশ মুসলমানরা; তাই ধর্মরাজকর্তৃক সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিক্রিয়ায় মনুষ্যজাতি হিসেবে মুসলমানদেরও

অন্তর্ভুক্তির একটা প্রচেষ্টা বরং এখানে খুঁজে পাই আমরা। বিচ্ছিন্নভাবে কেবলমাত্র জাতিগত শত্রুতার দৃষ্টিকোণ থেকে নিরঞ্জন-ধর্মরাজের উষ্মার প্রকাশকে চিহ্নিত না করাই শ্রেয়।

## সপ্তম অধ্যায়- গবেষণার মূল নির্যাস

ধর্মমঙ্গল কাব্যে একজন নারী পুরোহিতের কথা জানা যায়, যিনি পুরুষদেবতা শ্রীধর্মরাজের পূজার বিশেষ রীতি-পদ্ধতি ও প্রচার-প্রবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। এঁকে বলা হয় **সামুলা**। ধর্মপূজার যাবতীয় মন্ত্র-পদ্ধতি থাকে এঁর নখদর্পণে। ধর্মরাজের পূজানুষ্ঠানে পূজাসংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মনীতি ও মন্ত্রাদি সামুলার কণ্ঠস্থ থাকে, তাঁর নির্দেশ ও পরিচালনাতেই একাজ সুসম্পন্ন হয়। তাঁকে যথাযথ অনুসরণের জন্য পূজকগোষ্ঠীর অন্যান্য পণ্ডিতদের কাছে থাকে ধর্মপূজাবিধিবিধানের প্রায় অনুরূপ পুথির লিপি। বর্তমান সম্পাদিত পুথিটি [বিশ্ব.১২৯ সংখ্যক] এরকমই কোনও বিধিবিধানসংক্রান্ত পুথির অনুলিপি বলে আমাদের বিশ্বাস। সম্ভবত সেইকারণেই হরিশ্চন্দ্র-মদনার কথা, মার্কণ্ডমুনির কুষ্ঠরোগমুক্তি বা পাসানসিংহের আখ্যান বর্ণনায় একাধিকবার কোনও কোনও অংশের পুনরাবর্তন বা ভিন্ন পাঠান্তর পুথিতে লক্ষ করা গেছে।

সম্ভবত পূজাপদ্ধতির পাশাপাশি আখ্যানভাগের সমবেত পাঠ বা পরিবেশনের রীতি প্রচলিত ছিল। তাই অনুরূপ পুথির কয়েকটি লিপিকৃত অংশ পূজকগোষ্ঠীর প্রায় প্রত্যেকের কাছেই থাকত। তাঁরা উচ্চারণ করতেন সম্মিলিতভাবে নিজেদের মতো করে। এভাবেই সম্ভবত পূজার রীতিনীতির পাশাপাশি চলত উক্ত আখ্যানগুলির জমজমাট উপস্থাপন।

## অষ্টম অধ্যায়- অপরিচিত শব্দ ও তার অর্থসূচি

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা সম্পাদিত পুথিপাঠে প্রাপ্ত অপরিচিত শব্দগুলির উৎসসন্ধানে অভিনিবেশ করেছি। তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দগুলি আহরণ করে বর্ণক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে তার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি আমরা।

সামগ্রিক আলোচনায়, নানান কৌণিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করে একথা পরিশেষে বলা যায় যে, রামাই পণ্ডিতের এই রচনা নিছক নীরস কঠিন রীতি-নিয়মের ‘পণ্ডিত-পদ্ধতি’ নয়, এই কাব্য-বৃক্ষের শিকড় রাঢ়বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গের দেশ-কালের মাটির গভীরে সম্প্রসারিত। সম্পাদিত পাঠের পরতে পরতে তাই লুকিয়ে রয়েছে ঐতিহাসিকতা, সাংস্কৃতিক সংযুক্তি, সাহিত্যিক যৌক্তিকতা ও ভাষাতাত্ত্বিক আলাপচারিতা। সুতরাং রামাই পণ্ডিতের এই সৃষ্টি যে তৎকালীন সমাজ-পরিবেশ-ভাষাব্যবহার-সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভের একটি নির্ভরযোগ্য আকরগ্রন্থ সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।